Journal of Sociology
Vol. 14 Issue 1 & 2, 2023
ISSN: 1813-2871

Nazmul Karim Study Center
University of Dhaka

সমাজবিজ্ঞানী রংগলাল সেনের শিক্ষার্জন ও প্রয়োগ প্রসঙ্গ
(The Context of Achieving and Application of Education by Sociologist Rangalal Sen)

বাবুল চন্দ্র সূত্রধর*

সার-সংক্ষেপ

ড. রংগলাল সেন (১৯৩৩-২০১৪) অধ্যাপক হিসেবেই দেশে ও বিশ্বে পরিচিত ছিলেন। শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি প্রথমে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক পদে যোগ দেন, ১৯৬৪ সনে। পরের বছর একই পদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগে চলে আসেন। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়েছিল ১৯৫৩ সনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে। অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি বেশ কিছু সামাজিক-রাজনৈতিক সংগঠন ও বিদ্বৎ সমাজের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন, যার মধ্যে অন্যতম হল: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট, বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ সমাজবিজ্ঞান সমিতি, মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, বাংলা একাডেমী, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, বংগবন্ধু পরিষদ, শের-এ-বাংলা স্মৃতি পরিষদ, জালালাবাদ ছাত্রকল্যাণ ফাউন্ডেশন প্রভৃতি। তাছাড়া, তিনি চ্যান্সেলরের মনোনয়ন নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সদস্য হন। ২০১১ সনে ড. রংগলাল সেনকে জাতীয় অধ্যাপকের অনন্য মর্যাদা দান করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। ২০১৪ সনের ১০ ফেব্রুয়ারী দেশবরেণ্য এই জাতীয় অধ্যাপকের মহাপ্রয়াণ ঘটে। ড. রংগলাল সেন পরলোকগত হলেও তাঁর সমাজতাত্ত্বিক মূল্যবান কতিপয় গ্রন্থ তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে। শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে একজন মানুষের মধ্যে মানবীয় গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশ ঘটবে, যেখানে কোন প্রকার হিংসা ও হানাহানি থাকবে না, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সদাচার প্রদর্শিত হবে, অসাম্প্রদায়িক ও গণতন্ত্রমুখিন মানসলোকের সক্রিয় উপস্থিতি নিশ্চিত হবে, নৈতিকতা বোধসম্পন্ন যুক্তিশীল সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হবে- এই ছিল রংগলাল সেনের শিক্ষাদর্শের মূল কথা। রংগলাল সেন শুধু একজন মার্কসবাদী সমাজবিজ্ঞানী বা তাত্ত্বিক ছিলেন না, তিনি সমাজতন্ত্রের একজন একনিষ্ঠ কর্মীও ছিলেন। তাঁর ধর্মাদর্শ অনুযায়ী শুধু উপাসনা ও উপবাসের মধ্যে ধর্মচর্চাকে সীমিত না রেখে ব্যক্তিজীবনে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, অহিংসা ও পরার্থপরতার মাধ্যমে মানবসমাজকে অধিকতর সুন্দর করে তোলার মধ্যেই জীবনের প্রকৃত সার্থকতা নিহিত। ভাল মানুষ অথচ শিক্ষক হিসেবে ভাল নন, অথবা ভাল শিক্ষক অথচ মানুষ হিসেবে ভাল নন, রংগলাল সেনের কাছে এসব ছিল নিতান্তই অকল্পনীয় বিষয়। সকলের প্রতি তাঁর পরামর্শ ছিল- সবকিছুর আগে ভাল মানুষ হতে হবে। প্রকৃত

* গবেষক, রির্সাচ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ ও মানবাধিকার কর্মী।
E-mail: bc_sutradhar@yahoo.com

DOI:

শিক্ষায় সুসমৃদ্ধ হয়ে আমৃত্যু এক ও অভিন্ন আদর্শ বুকে ধারণ করেছেন। তাইতো দল-মত নির্বিশেষে পরিচিতজন মাত্রই তাঁর প্রতি সর্বদা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন ও আছেন। রংগলাল সেনের অর্জিত শিক্ষা ও শিক্ষার প্রায়োগিক দিক বিবেচনা করে তাঁকে একজন মানবতাবাদী সমাজবিজ্ঞানী, সমতাবাদী শিক্ষাবিদ ও নৈতিকতাবাদী মানবপ্রেমিক হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। সুপ্রসন্ন ভাগ্যের অধিকারী রংগলাল সেন জীবনে এমন সব মহান ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তাঁদের আদর্শ এমনভাবে লালন করেন, যাতে করে তাঁর আদর্শরেখায় কখনো ছেদ পড়েনি। সমাজবিজ্ঞানের আলোকে শিক্ষা প্রত্যয়টির অনুসন্ধান করলেও ড. সেনের ব্যক্তিত্বের গঠন-প্রণালী সম্পর্কে সম্যক অনুধাবন করা যায়। বক্ষ্যমান ক্ষুদ্র নিবন্ধে ব্যক্তি রংগলাল সেনের প্রতিষ্ঠানসম হয়ে ওঠা এবং এর পেছনে ক্রিয়াশীল অনুঘটকগুলো সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে রংগলাল সেনের শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন ও এতে শিক্ষার প্রয়োগ, তাঁর আদর্শিক ব্যক্তিত্ব গঠনের পটভূমি হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রভাব, আদর্শের পরম্পরা প্রভৃতি বিষয় আলোচনার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

Abstract

Dr. Rangalal Sen (1933-2014) was known in the country and abroad as a professor. After completing his education from Dhaka University, he first joined the Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET) as a lecturer in 1964. In the next year, he moved to the Department of Sociology of Dhaka University in the same position. His career began in 1953 as a primary school teacher. Apart from teaching, he was actively associated with several socio-political organizations and learned societies, including: Dhaka University Teachers' Association, Dhaka University Senate, Bangladesh College-University Teachers' Association, Bangladesh Sociological Association, Expatriate Bangladesh Government, Bangladesh Itihas Parishad, Bangla Academy, Bangladesh Asiatic Society, Communist Party of Bangladesh, Bangabandhu Parishad, Sher-e-Bangla Smriti Parishad etc. Moreover, he became a syndicate member of many universities at many times on the nomination of the Chancellor. In June 2011 the Government of the People's Republic of Bangladesh awarded Rangalal Sen in the unique status of National Professor. This distinguished professor passed away on February 10, 2014. Even though Dr. Rangalal Sen passed away, some of his sociologically valuable works will survive him. By acquiring education, human qualities will be fully developed in a person, where there will be no violence and strife, mutual kindness will be displayed among people, the active presence of non-communal and democratic mind will be ensured, a rational social system with moral sense will be established - this was Rangalal Sen's philosophy of education. Rangalal Sen was not only a Marxist sociologist or theorist but also a dedicated worker of socialism. According to his philosophy, the true meaning of life lies in making the human society more beautiful through honesty, justice, non-violence and altruism in personal life without limiting

religious practice to worship and fasting. A good person but not good as a teacher, or a good teacher but not good as a person- these were completely unthinkable things for Rangalal Sen. His advice to everyone was to be a good person first. Enriched with real education, he has always kept one and the same ideal in his heart. Therefore, regardless of the party and opinion, only those who know him were and are always respectful to him. Rangalal Sen can be termed as a humanistic sociologist, egalitarian educationist and moralistic philanthropist considering the education achieved by him and its practical aspects. Rangalal Sen, who was blessed with good fortune, got close to such great persons in his life and cherished their ideals in such a way that his line of ideals never crossed., Dr. Sen's personality formation can be well understood in the light of sociological judgement of education. This short article attempts to explore the institutionalization of Rangalal Sen and the catalysts behind it. For this purpose, Rangalal Sen's educational life, career and application of education in it, influence of institutional and non-institutional education as a background for the formation of his ideal personality, reciprocity of ideals etc. are discussed.)

"প্রত্যেক মানবাত্মার জ্ঞানার্জন ক্ষমতা ছাড়াও এমন সব ইন্দ্রিয় থাকে যার সাহায্যে সত্যের রূপ দর্শন করতে পারে"[১]

১. ভূমিকা

সৃষ্টির আদিযুগে মানুষ পদে পদে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে, কিন্তু সমস্যার সমাধানে কোন সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল জ্ঞানের উপস্থিতি ছিল না। কিন্তু মানুষ দমে যায় নি- তার যা কিছু সম্বল ছিল তা নিয়েই সমস্যা থেকে উত্তরণের চেষ্টা করেছে এবং দেরীতে হলেও সফল হয়েছে বলেই মানুষ আজ বিজ্ঞানের জগতে উপনীত হতে পেরেছে। কারণ, মানুষ নিয়তই সৃজনশীল প্রাণী। সৃজনশীলতার অদম্য অভিলাষের বদৌলতে মানুষ জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছে। যেখানে যে সত্য লুক্কায়িত রয়েছে, যথাযথ অনুসন্ধানের মাধ্যমে তা উদঘাটিত করে চলেছে। এখানেই মানুষ ক্ষান্ত নয়, আত্মপ্রসাদে বিভোর নয়; বরং উদঘাটিত সত্যকে বার বার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছে, পেছনের যত ঘটনা টেনে টেনে বের করছে। এভাবে সৃষ্টি লাভ করছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখা-প্রশাখা। আবার সকল শাখা-প্রশাখা প্রবল বেগে ছুটে চলেছে এক অভিন্ন গন্তব্যের পানে- অখণ্ড সত্যের অভিমুখে। অর্থাৎ এসব শাখা-প্রশাখা জ্ঞানসমুদ্রে আত্মবিসর্জন দিতে পারলেই সার্থকতা লাভ করে। জ্ঞান নিয়তই সত্যাশ্রয়ী- সত্যের সাথে সম্পর্কহীন কোন কিছুকেই প্রকৃত অর্থে জ্ঞান বলা যায় না; আর সত্য যেহেতু অখণ্ড, তাই সত্যের কোন ভেতর-বাইর, কমতি-বাড়তি নেই- এগুলো মানব-জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার মধ্যেই ঘুরপাক খেতে থাকে। কবি ও বিজ্ঞানীর বিচরণক্ষেত্র ও অনুসন্ধান পদ্ধতি ভিন্নতর হলেও চূড়ান্ত লক্ষ্য এক, এই বিবেচনায় বিজ্ঞানাচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু এ বিষয়ে একটি চমৎকার কথা বলেছেনঃ "কক্ষে কক্ষে সুবিধার জন্য যত দেয়াল তোলাই যাক না, সকল মহলেরই এক অধিষ্ঠাতা। সকল বিজ্ঞানই পরিশেষে এই সত্যকে আবিষ্কার করিবে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথে যাত্রা করিয়াছে। সকল পথই যেখানে একত্র মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণ সত্য। সত্য খণ্ড খণ্ড হইয়া আপনার মধ্যে অসংখ্য বিরোধ ঘটাইয়া অবস্থিত নহে। সেইজন্য

প্রতিদিনই দেখিতে পাই জীবতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব আপন আপন সীমা হারাইয়া ফেলিতেছে। বৈজ্ঞানিক ও কবি উভয়েরই অনুভূতি অনির্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে।"[২]

এসব শাস্ত্রের অন্যতম শাখা সমাজবিজ্ঞানের আশ্রয়ে সত্যস্নাত হওয়ার মানসে একরৈখিক জীবনচর্যা প্রতিষ্ঠার দুর্মূল্য সংগ্রামে আত্মোৎসর্গকারী মহান ব্যক্তিদের মধ্যে আজকের আলোচ্য জাতীয় অধ্যাপক রংগলাল সেন (১৯৩৩-২০১৪) মহোদয় অন্যতম। নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে রেখে গেছেন হিমালয়সম সুদৃঢ় আদর্শিক চেতনার এক সুবিশাল নিশানা। অধীত ও অর্জিত শিক্ষায় সুসমৃদ্ধ হয়ে আমৃত্যু এক ও অভিন্ন আদর্শ বুকে ধারণ করেছেন। তাইতো দল-মত নির্বিশেষে পরিচিতজন মাত্রই তাঁর প্রতি সর্বদা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন ও আছেন। বক্ষ্যমান ক্ষুদ্র নিবন্ধে ব্যক্তি রংগলাল সেনের প্রতিষ্ঠানসম হয়ে ওঠা এবং এর পেছনে ক্রিয়াশীল অনুঘটকগুলো সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব। এ উদ্দেশ্যে রংগলাল সেনের শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন ও এতে শিক্ষার প্রয়োগ, তাঁর আদর্শিক ব্যক্তিত্ব গঠনের পটভূমি হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রভাব, আদর্শের পরম্পরা প্রভৃতি বিষয় আলোচনার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আর, জ্ঞানশাখা হিসেবে সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা প্রত্যয়টিকে কিভাবে বিবেচনা করে, তাও কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হবে। বিনীতভাবে বলে রাখা আবশ্যক যে, অধ্যাপক ড. সেন শুধু আমার প্রত্যক্ষ শিক্ষকই ছিলেন না, ছিলেন পিতৃসম অমীয় দায়িত্শীল একজন অভিভাবকও; তাই নিবন্ধের নানা স্থানে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, অনুভূতি এমনকি আবেগেরও প্রয়োগ ঘটতে পারে।

২. রংগলাল সেন

অধ্যাপক রংগলাল সেন ১৯৩৩ সনের ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখে কোন এক শুভক্ষণে মৌলভীবাজার সদর উপজেলাধীন ৩ নং কামালপুর ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত ত্রৈলোক্যবিজয় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃদত্ত নাম মনোমোহন। বাল্যকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। পড়াশোনার পাশাপাশি গ্রামের অন্যান্য ছেলেদের মত তিনিও খেলাধুলা, দৌড়ঝাঁপ থেকে শুরু করে ক্ষেতের মাঠে খাবার নিয়ে যাওয়া, মাঝে মাঝে গৃহপালিত প্রাণীদের পরিচর্যা- সব কিছুই করতেন। "সারা কার্তিক মাস ব্যাপী শেষ রাতে সনাতন ধর্মাবলম্বী পাশের বাড়ীগুলোতে 'মঙ্গলা কীর্তন' চলত, যা খুব ভোর বেলায়ই শেষ হয়ে যেত। কীর্তনের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যেত। ঘুম থেকে ওঠে অন্ধকারের মধ্যেই সঙ্গীসাথী মিলে বাড়ী বাড়ী গিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করতাম। সে প্রসাদের সুঘ্রাণ ও কীর্তনের সুমধুর ধ্বনি আজও যেন মনে সজীব হয়ে আছে"- অত্যন্ত আবেগভরা কণ্ঠে তিনি বাল্যকালের স্মৃতি রোমন্থন করতেন।

বর্তমানে কর্মসূত্রে ও লেখাপড়ায় প্রায় সবাই বাড়ীর বাইরে বসবাস করছেন। জেলা শহর থেকে ৯-১০ কিলোমিটার উত্তরের এ গ্রামটি খরস্রোতা মনু নদীর তীরে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পাশে অবস্থিত। মনু নদীর ওপর স্থাপিত সেতুটি একেবারে সেন পরিবারের বাড়ীর লাগোয়া, 'নতুন ব্রীজ' নামে এখানে বাস স্টপসহ বিশাল বাজার জমে উঠেছে। জমিজমা কেনাবেচা বিঘা (স্থানীয়ভাবে 'কিয়ার' নামে প্রচলিত, যা ৩০ শতাংশের সমান)-র পরিবর্তে শতাংশে এসে পৌঁছেছে। প্রবাসী অধ্যুষিত এলাকা বলে দামও আকাশচুম্বী। কৃষিজীবী হিসেবে সেন পরিবারের একদা বেশ জমিজমা ছিল, বিভিন্ন কারণে এর সবটুকু ধরে রাখা সম্ভব হয়নি।

২.ক. শিক্ষাজীবন

রংগলাল সেনের শিক্ষাজীবন শুরু হয় ১৯৪০ সনে স্থানীয় বাসুদেবশ্রী মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির মাধ্যমে। ১৯৪৬ সনে 'মিডল স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট' পরীক্ষায় বৃত্তিসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৫০ সনে মৌলভীবাজার সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে

ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৫৫-৫৬ শিক্ষাবর্ষে সিলেট প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন, যেখানে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের চৌদ্দশত প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৭ সনে বহিরাগত পরীক্ষার্থী হিসেবে মৌলভীবাজার মহাবিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে আই এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৯-১৯৬৩ সনের মধ্যে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর কোর্স সম্পন্ন করেন। তিনি উভয় পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেন। উল্লেখ্য, তিনি সমাজবিজ্ঞান বিভাগে সর্বপ্রথম প্রথম শ্রেণী অর্জনকারী মেধাবী ছাত্র। ১৯৭৩-১৯৭৭ সময়কালে তিনি যুক্তরাজ্যের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথমে এম এ ও পরে পি-এইচ ডি ডিগ্রী অর্জন করেন।

২.খ. কর্মজীবন

রংগলাল সেনের শিক্ষাজীবনের গতি-প্রকৃতি দেখলে যে কারোরই মনে প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে- একজন মেধাবী ছাত্রের পাসের সনে এত ব্যবধান কেন? ১৯৫৩ সনে স্থানীয় বাসুদেবশ্রী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে রংগলাল সেনের কর্মজীবনের সূত্রপাত ঘটে। তাঁর গৃহশিক্ষক ও ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী নরেশ চন্দ্র দাস মেধাবী ছাত্র হিসেবে তাঁকে এখানে নিযুক্ত হতে উৎসাহিত করেন। একটি বৃহৎ পরিবারের ভরণ-পোষণ ও সকল সন্তানের লেখাপড়ার ব্যয়ভার চালিয়ে যাওয়া কৃষিজীবী পরিবারের কর্তা বাবার পক্ষে বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। বিষয়টি অনুধাবন করে বাবা-মাকে রাজী করিয়ে তিনি শিক্ষকতায় যোগ দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পূর্ব পর্যন্ত তিনি মৌলভীবাজার জেলার বেশ ক'টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথমে সহকারী শিক্ষক ও পরে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রধান শিক্ষক হিসেবে তাঁর সর্বশেষ কর্মস্থল ছিল জেলা শহরের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত শ্যামরায়ের বাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি প্রথমে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক পদে যোগ দেন, ১৯৬৪ সনে। শুরু হয় দ্বিতীয় পর্বের শিক্ষকতার পেশা। পরের বছর একই পদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগে চলে আসেন। বলা যায়, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রায় প্রতিষ্ঠাকালীন ছাত্র ও পরে শিক্ষক হয়ে তিনি বাংলাদেশে উক্ত জ্ঞানশাখার বিকাশ ও বিস্তারে বিশাল অবদান রাখেন। সরদার ফজলুল করিম অধ্যাপক ড. হরিদাস ভট্টাচার্যকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালরেয় দর্শন বিভাগের 'সংগঠক'[৩] হিসেবে অভিহিত করেছিলেন, সমাজবিজ্ঞান ও রংগলাল সেন সম্পর্কে ঠিক একই কথা খাটে। পদোন্নতি পেয়ে পেয়ে শিক্ষকতার সর্বোচ্চ পদ অধ্যাপকের দায়িত্বে উন্নীত হয়ে কর্মজীবনের সমাপ্তি টানেন। সমাজবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান, জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ প্রভৃতি প্রশাসনিক দায়িত্বও দক্ষতার সাথে পালন করেন তিনি। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি বেশ কিছু সামাজিক-রাজনৈতিক সংগঠন ও বিদ্বৎ সমাজের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন, যার মধ্যে অন্যতম হল: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট, বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ সমাজবিজ্ঞান সমিতি, মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, বাংলা একাডেমী, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, বংগবন্ধু পরিষদ, শের-এ-বাংলা স্মৃতি পরিষদ, জালালাবাদ ছাত্রকল্যাণ ফাউন্ডেশন প্রভৃতি। তাছাড়া, তিনি চ্যান্সেলরের মনোনয়ন নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সদস্য হন।

২০১১ সনের ১৪ জুন আরোও চারজন গুণী ব্যক্তির সাথে ড. রংগলাল সেনকে জাতীয় অধ্যাপকের অনন্য মর্যাদা দান করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। এ উপলক্ষ্যে তাঁকে সংবর্ধনা প্রদান করে জগন্নাথ হল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন; স্মারক-পত্রে বলা হয়:

"শিক্ষার্থীদের প্রতি আপনার স্নেহস্নিগ্ধ প্রসন্নতাময় নৈষ্ঠিক অধ্যাপনা কিংবদন্তিতুল্য। শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, গবেষক, শিক্ষক-নেতা ও শিক্ষা-প্রশাসক রূপে আপনার অবদান এবং স্বদেশ ও মানবিকতার প্রতি দায়বদ্ধতার স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় অধ্যাপক পদে বৃত হওয়ার বিরল সম্মানে সম্মানিত হওয়ায় আপনার জন্য আমরা গর্বিত"।[৪]

ড. রংগলাল সেন পরলোকগত হলেও তাঁর সমাজতাত্ত্বিক মূল্যবান কতিপয় গ্রন্থ তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে। বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে গ্রন্থ রচনায় তাঁর সমকক্ষ আর কেউ আছেন কিনা, জানা নেই। তাঁর ২৩টি গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম হল: Middle Class, Elites, Civil Society and Other Essays- 2 vols. (2011), বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান (সম্পাদনা-যৌথ) (২০০৯), পরিবর্তনশীল সমাজ: ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ (এ কে নাজমুল করিম) অনুবাদ-যৌথ (২০০৮), প্রারম্ভিক সমাজবিজ্ঞান (যৌথ) (২০০৩), সিভিল সোসাইটি (২০০৩), সমাজবিজ্ঞান (স্যামুয়েল কোনিগ) অনুবাদ (২০০২), বাংলাদেশ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (২০০৩), মানুষের সমাজ (জর্জ সিম্পসন) অনুবাদ (২০০০), সমাজকাঠামো: পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র (১৯৯৭), Political Elites in Bangladesh (1986), ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা স্মারকগ্রন্থ (সম্পাদনা-যৌথ) (১৯৮৬), বাসন্তিকা-জগন্নাথ হল বার্ষিকী হীরক জয়ন্তী সংখ্যা (১৯৮৫), বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস (১৯৮৫), ড. নাজমুল করিম স্মারকগ্রন্থ (সম্পাদনা-যৌথ) (১৯৮৪) প্রভৃতি। দেশী-বিদেশী গবেষণা জার্নালে তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য, তাঁর আরোও বেশ কিছু লেখালেখি ও প্রকাশনার পরিকল্পনা ছিল, শারীরিক অবস্থার অবনতিতে তা আর হয়ে ওঠেনি।

২.গ. বার্ধক্য জীবন ও মৃত্যু

চল্লিশ বছর বয়সের দিকে ড. সেনের ডায়াবেটিক রোগ ধরা পড়ে। তখন থেকেই তিনি স্বাস্থ্য ও শরীরের প্রতি বিশেষ যত্নবান হয়ে ওঠেন। খাওয়া-দাওয়া, ঘুমানো, প্রাতঃভ্রমণ, স্নান থেকে শুরু করে সকল নিত্যকর্ম তিনি কাঁটায় কাঁটায় সময় মেনে পরিচালনা করতেন। শুধু তাই নয়, স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী নয় এমন খাবার তিনি কারো অনুরোধে গ্রহণ করতেন না। একবার তাঁর সাথে গিয়েছিলাম নিরঞ্জন অধিকারী (অধ্যাপক, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) স্যারের বাসায়। কুশলাদি বিনিময় পর্বেই তিনি বলে ফেলেন, 'আমাকে খাবারের কিছু দেবেন না, যদি নিতান্তই দিতে চান তাহলে শুধু এক কাপ দুধ দেবেন'। যার ফলে তিনি ক্ষণে ক্ষণে রোগাক্রান্ত হতেন না। বাংলাদেশ ডাযাবেটিক সমিতি তাঁকে দু'বার শ্রেষ্ট নিয়মনিষ্ট রোগী হিসেবে পুরস্কৃত করে। ২০১২ সনের প্রথমদিক থেকে তিনি প্রায়শ:ই অসুস্থতা বোধ করতেন। মাঝে মাঝে হাসপাতালেও ভর্তি হতে হত। স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি থাকা অবস্থায় উন্নত চিকিৎসা ও সেবার কথা বিবেচনা করে তাঁকে তাঁর বড় মেয়ে পাপড়িদি (ডা: সূচনা সেন) তাঁদের চট্টগ্রামের বাসায় স্থানান্তরিত করেন। জীবনের শেষ দু'মাস তিনি চট্টগ্রামের সার্জিস্কোপ হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। ২০১৪ সনের ১০ ফেব্রুয়ারী দেশবরেণ্য এই জাতীয় অধ্যাপকের মহাপ্রয়াণ ঘটে। তবে সমাজবিজ্ঞানীর কর্তব্য হিসেবে 'সামাজিক ব্যবস্থা ও আদর্শের ভিত্তির বিশ্লেষণ'[৫]-কে তিনি যথাযোগ্যভাবেই সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন।

৩. রংগলাল সেনের জীবনাদর্শ

শিক্ষক ও অন্যান্য দায়িত্ব পালনকালে ড. রংগলাল সেনের একটি অনন্যসাধারণ পরিচিতি ছিল; আর, তা হচ্ছে 'ভাল মানুষ' হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি। জীবনের প্রতিটি কর্ম ও মুহূর্তকে তিনি নিষ্কলুষ রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমরা এবারে তার আদর্শিক জীবনচর্যার প্রধান ক'টি দিক অনুসন্ধান করব, যাতে করে ব্যক্তি রংগলাল সেনের জীবনের অর্জন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়।

৩.ক. শিক্ষাদর্শ

শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে একজন মানুষের মধ্যে মানবীয় গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশ ঘটবে, যেখানে কোন প্রকার হিংসা ও হানাহানি থাকবে না, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সদাচার প্রদর্শিত হবে, অসাম্প্রদায়িক ও গণতন্ত্রমুখিন মানসলোকের সক্রিয় উপস্থিতি নিশ্চিত হবে, নৈতিকতা বোধসম্পন্ন যুক্তিশীল সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হবে - এই ছিল রংগলাল সেনের শিক্ষাদর্শের মূল কথা। "সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাখাতে পুজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না"[৬]-বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শনের এই অমূল্য বাণীতে তাঁর ছিল অগাধ ভরসা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি সমাবর্তনে উপাচার্য স্যার আহমেদ ফজলুর রহমান (এ এফ রহমান) এ বিষয়ে যে অতীব মূল্যবান অভিভাষণ প্রদান করেন, সেগুলোর অংশবিশেষ রংগলাল সেন তাঁর এক লেখায় সযত্নে উদ্ধৃত করেছেন:

> ".. there is a gulf between the intelligentsia and the masses. You have to bridge that gulf. All your education would be purposeless if you do not carry back with you to your homes the atmosphere of your University- the spirit of comradeship rather than communal isolation, clean living, clean thinking and the steady adherence to the ideals of social service." *(12th Convocation, 16th August, 1934)*[৭]

> "You have also to possess the ability to win the confidence and goodwill of the people among whom you live and work… In that sense politics may be said to be a branch of the art of getting on with other people... the underlying ideas of politics should be stated to be free from prejudice and outworn terminology...The duty of all of us is first of all to put ourselves right and then help democracy. True democracy is not an external government but an inward rule. The democracy of the heart has to be developed before we get democracy fulfilled in practice." *(14th Convocation, 29th July, 1936)*[৮]

উল্লেখ করা আবশ্যক যে, প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও শিক্ষাবিদ স্যার এ এফ রহমান (১৮৮৯-১৯৪৫) ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩য় উপাচার্য ও দেশীয় তথা বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম।

সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে যে, একজন শিক্ষার্থীকে সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রথমে নিজেকে অসাম্প্রদায়িক ও গণতন্ত্রী করে গড়ে তুলতে হবে এবং পরবর্তীতে সে গুণগুলো সমাজ ও রাষ্ট্রে ছড়িয়ে দেবে। এহেন মননশীলতা যখন গোটা সমাজে প্রবাহিত হবে অবারিতভাবে, তখনই উন্মোচিত হবে সামাজিক সংহতি তথা শান্তি-শৃংখলার সিংহদ্বার। অধ্যাপক সেন শুধু এসব কথা লিখেছেন বা উদ্ধৃত করেছেন এমন নয়, আজীবন সে আদর্শিক চেতনা সনিষ্টভাবে লালন করেছেন। শিক্ষকতা, রাজনীতি, প্রশাসন, অভিভাবকত্ব, বন্ধুত্ব প্রভৃতি যখন যে অধিক্ষেত্রে কর্ম পরিচালনা করেছেন, কোথাও তিনি তাঁর অর্জিত চেতনা থেকে সরে যান নি।

৩.খ. রাজনৈতিক আদর্শ

রংগলাল সেন শুধু একজন মার্কসবাদী সমাজবিজ্ঞানী বা তাত্ত্বিক ছিলেন না, তিনি এর একনিষ্ট কর্মীও ছিলেন। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। বাংলার ইতিহাসের বিখ্যাত বাষট্টির এস এম শরীফ শিক্ষা কমিশন বিরোধী

ছাত্র আন্দোলনের সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন এবং ঐ আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েন। এ সময় তিনি কমরেড মো: ফরহাদসহ অনেক নেতার সাথে সুপরিচিত হন। তিনি বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের একজন কর্মী হিসেবে ১৯৬৩ সনে জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদের সমাজসেবা সম্পাদক নির্বাচিত হন। বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানের চার মূলনীতি তথা বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র- এর প্রতি ছিল তাঁর অবিচল আস্থা ও শ্রদ্ধা।

মানব সভ্যতার আদি গুরু এরিস্টটল মানুষকে সামাজিক জীব বলে যে আখ্যা দেন, ড. সেন কার্ল মার্কসের চিন্তা যোগ করে একে আরোও এগিয়ে নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন; অর্থাৎ, মানুষ শুধু সামাজিক জীব নয়, রাজনৈতিক জীবও[৯]। রাজনৈতিক চেতনা ব্যতিরেকে একজন মানুষের জীবন পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। সমাজবিজ্ঞানের বিদগ্ধ গবেষক ড. সেনের রাজনৈতিক দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'সকল মানুষ'। আধুনিক উন্নয়নতত্ত্বে 'কাউকে পেছনে ফেলে নয়' (*no one left behind*) বলে যে ধ্বনি সর্বত্র শোনা যাচ্ছে, তা তাঁর রাজনৈতিক সমাজমানসে বহু আগে থেকেই ক্রিয়াশীল ছিল।

অগণতান্ত্রিক ও স্বার্থবাদী সামাজিক স্তরবিন্যাস এবং এর পেছনে রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতার ফলে সমাজে উঁচু-নীচু নানা শ্রেণী জন্ম লাভ করে। উঁচু শ্রেণীর লোকজন অধিকতর মাত্রায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগের মাধ্যমে সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি করে। রংগলাল সেনের অনেক লেখায় বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ওঠে এসেছে। তাঁর সুপরিচিত ও পাঠকনন্দিত গ্রন্থ 'বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস'-এ উক্ত বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। গ্রন্থটির শুরুতে সামাজিক স্তরবিন্যাস, অসমতা ও সচলতার প্রত্যয়গত ধারণা ও প্রকৃতি উপস্থাপন করা হয়েছে। পরে একাদিক্রমে বাংলাদেশে সামাজিক স্তরবিন্যাসের ঐতিহাসিক পটভূমি, প্রাক-মুসলিম, মুসলিম, বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে এবং বর্তমান বাংলাদেশে উক্ত প্রত্যয়টির বাস্তব অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। গ্রন্থের উপসংহারে এসে তিনি সামাজিক স্তরবিন্যাসের আলোকে বাংলাদেশের জনসমষ্টির তিনটি স্তর নিরূপণ করে যে মূল্যবান দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেছেন তা সকল স্তরের গবেষক ও চিন্তাবিদের জন্য অবশ্য পঠিতব্য বলে আমার মনে হয়: "বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৭ জন নিম্নস্তরে, শতকরা ৮ জন মধ্যস্তরে ও শতকরা ৫ জন উচ্চস্তরে অবস্থান করছে। বর্তমান বাংলাদেশে যে অর্থনীতি, শিল্পনীতি, ভূমিনীতি ও উন্নয়ন-কৌশল চালু আছে তার মাধ্যমে মাত্র ঐ ৫ ভাগ লোকই উপকৃত হচ্ছে। .....অতএব বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধনে যারা সত্যিকার আগ্রহী তাদেরকে অবশ্যই উক্ত সামাজিক স্তরবিন্যাসের বাস্তব চিত্র বিবেচনায় রেখে এমন মৌলিক পরিবর্তনের কথা ভাবতে হবে, যার ফলে ঐ ধরনের বৈষম্যমূলক সমাজ- ব্যবস্থার চিরতরে অবসান ঘটে এবং এর পরিবর্তে একটি শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানেই রাজনীতির সাথে উন্নয়ন পদ্ধতির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান।"[১০]

৩.গ. ধর্মীয় ও নৈতিক আদর্শ

"ধর্ম সামাজিক সংহতির চূড়ান্ত সূত্র। সমাজের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় শর্ত হচ্ছে মানবিক মূল্যবোধের অভিন্ন অধিকার যার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।.. ধর্ম হচ্ছে এসব মূল্যবোধের ভিত্তিস্বরূপ। ছেলে-মেয়েরা পিতা-মাতার অবাধ্য হবে না, কখনও তারা মিথ্যা কথা বলবে না, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আস্থা অক্ষুন্ন থাকবে, মানুষ সৎ ও ধর্মপ্রাণ হবে- এসব মূল্যবোধ সামাজিক সংহতি সংরক্ষণের সহায়ক।.. ধর্ম মানুষের ইহজাগতিক ব্যর্থতার পরিবর্তে ভাল কাজ করার মাধ্যমে স্বর্গলাভে আশ্বস্ত করে"[১১]- অতিশয় সহজ-সরল কথার মাধ্যমে রংগলাল সেন তাঁর ধর্মানুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি ইহজগত ও

পরজগতের মধ্যে ধর্মের সুমসৃণ মৈত্রীসেতু নির্মাণে প্রয়াসী ছিলেন। ইহজগতে লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, ক্রোধ, পরমতে অসহিষ্ণুতা ও আত্মস্বার্থ সিদ্ধির সামাজিক স্তরবিন্যাসপ্রসূত বৈষম্য তথা রক্তারক্তি হানাহানি অব্যাহত থাকবে আর পরজগতে স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটবে- তিনি এ ধারণার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল- মানুষে মানুষে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালবাসা ব্যতীত সমাজে যেমন শান্তি-শৃংখলা আসতে পারে না, তেমনি পরজগতে স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করাও সম্ভব হবে না। ইংরেজ কবি উইলিয়াম ব্লেক (১৭৫৭-১৮২৭) যেমনটা বলেছিলেন,

"For all must love the human form
In heathen, Turk or Jew,
Where mercy peace and pity dwell
There God is dwelling too".[১২]

বুঝা যায়, রংগলাল সেনের এহেন ধারণা সৃষ্টির পেছনে রয়েছে তাঁর অধীত ও অধ্যাপনীয় শাস্ত্র সমাজবিজ্ঞানের এক বিরাট অনুপ্রেরণা। তাঁর ধর্ম ও নৈতিকতা সংক্রান্ত ব্যাখ্যায় অগাস্ট কোঁত, কার্ল মার্কস, এমিল ডুর্খীম, ম্যাক্স ওয়েবার, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সমাজ-দার্শনিকের সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আর, পিতা-মাতা সহ শিক্ষকদের প্রভাব তো ছিলই। শুধু উপাসনা ও উপবাসের মধ্যে ধর্মচর্চাকে সীমিত না রেখে ব্যক্তিজীবনে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, অহিংসা ও পরার্থপরতার মাধ্যমে মানবসমাজকে অধিকতর সুন্দর করে তোলার মধ্যেই জীবনের প্রকৃত সার্থকতা নিহিত। শুধু ইহজগত-পরজগত নয়, তিনি ধর্মানুশীলনের প্রাচ্য-প্রতীচ্যেরও সমন্বয়ে বিশ্বাসী ছিলেন। শান্তি-শৃঙ্খলা মূলত একটি নির্ভরশীল চলক, এটি এককভাবে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে না, প্রয়োজন সকলের অংশগ্রহণমূলক আন্তরিক সহযোগিতা। সমাজে প্রচলিত আনুষ্ঠানিক ধর্মচর্চায় রংগলাল সেনকে ততটা তৎপর হতে দেখা যায়নি। কিন্তু ধর্মাদর্শের বর্ণিত মৌল উপাদান-সমৃদ্ধ জীবন পরিচালনায় তিনি কঠোর অধ্যবসায়ী ছিলেন। নানা কর্মকাণ্ড, আচরণ তথা লেখালেখিতে তিনি ইস্পাতসম নৈতিকতাবোধের স্বাক্ষর রেখেছেন। ধর্মীয় সভা-সমাবেশেও তিনি একই আদর্শের জয়ধ্বনির কথা বলেছেন।

৩.ঘ. মানবতা ও মানবাধিকার

মানুষকে বৈষম্যহীনভাবে মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করে তার মানবিক চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা মানবতা কিংবা মানবাধিকারের প্রথম শর্ত। আমার উপলব্ধি মতে অধ্যাপক সেন সে শর্ত পূরণ করে আরোও বহুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ আমি নিজে অবাক বিস্ময়ে বহুবার বহুভাবে প্রত্যক্ষ করেছি। গৃহকর্মী, রিকশা ও ভ্যানচালক থেকে শুরু করে জুতার কারিগর- সকলের প্রতি তাঁর আচরণ ছিল অত্যন্ত আন্তরিক। তাদের সাথে তিনি সুযোগ পেলেই রীতিমত আড্ডা জমিয়ে বসতেন। নানা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে জবাব নিতেন। পরে বলতেন, 'দেখেছ, সাধারণ মানুষরা কত গভীরভাবে ভাবতে জানে!'

'জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদ ও মানবাধিকার আন্দোলনের ধারা' প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত 'আফ্রিকা' কবিতা থেকে যে উদ্ধৃতি টেনেছেন, অধিকার বঞ্চিত জনগোষ্ঠী ও একইসাথে অধিকার লুণ্ঠনকারীদের সম্পর্কে তাঁর অবস্থান বুঝে নিতে কোনরূপ সমস্যার অবকাশ থাকে না:

হায় ছায়াবৃতা
কালো ঘোমটার নীচে
অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ

উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।
এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে,
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এল মানুষ ধরার দল।
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে
পঙ্কিল হল ধুলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে,
দস্যু-পায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলায়
বীভৎস কাদার পিণ্ড
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে।[১৩]

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনগণ ও সরকারের সম্পর্ক যত বেশী মাত্রায় ঘনিষ্ট ও প্রত্যক্ষ হবে, উন্নয়নের সুফল তত বেশী মাত্রায় দৃষ্টিগ্রাহ্য হবে। জাতিসংঘের উদ্যোগে পরিচালিত সমাপ্তকৃত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (*Millennium Development Goals-MDGs*)[১৪] ও চলমান টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (*Sustainable Development Goals- SDGs*)[১৫] বাস্তবায়নের মাধ্যমে সদর্থক ফল প্রাপ্তির লক্ষ্যে রাষ্ট্রের জনগণ ও সরকারের পারস্পরিক সহযোগিতামূলক চিন্তা ও কর্মের কথাই সুক্ষ বিচারে ধরা পড়ে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রংগলাল সেন সমাজের সকল মানুষের মধ্যে যুগপৎ সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা অবলোকনে প্রয়াসী ছিলেন। অধিকার মূলত একটি আইনী প্রত্যয়, যা রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত। নাগরিক যদি রাষ্ট্রে তার অধিকার সম্পর্কে জানতে না পারে তাহলে একদিকে সে তার পিছিয়ে পড়া (নাকি দেওয়া) অবস্থান থেকে ওঠে আসার সুযোগ পায় না; অপরদিকে রাষ্ট্রে তার কর্তব্যও সুষ্টুভাবে পালন করতে পারে না। ড. সেন চূড়ান্তভাবে সমাজের পিছিয়ে পড়া লোকজনের মধ্যে মার্ক্সীয় 'বিচ্ছিন্নতা' (alienation)-র সক্রিয় উপস্থিতি লক্ষ্য করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যক্তিকে 'বাস্তব ব্যক্তি'[১৬] হিসেবে আত্মপ্রকাশের নির্দেশনা দেন। অধ্যাপক আনিসুর রহমানের কথায় এরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই: "যদি কোনদিন গ্রামীণ শ্রমজীবীদের নেতৃত্বে দেশে একটি ইতিবাচক গতিশীলতা আসে. তবে এই গতিশীলতা তার নিজস্ব গণতন্ত্রও রচনা করবে।"[১৭] তখন 'অধিকার' 'অধিকার' বলে এত শোরগোলেরও প্রয়োজন হবে না।

৪. আদর্শের সূত্র-সমন্বয় ও বিতরণ পদ্ধতি

শিক্ষা, রাজনীতি, ধর্ম, নৈতিকতা, মানবাধিকার প্রভৃতি আদর্শিক অধিক্ষেত্রে অধ্যাপক রংগলাল সেনের অবস্থান নিয়ে আমরা যে আলোচনা করে এলাম, তাতে এক চমৎকার সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে যেকোন মহাপ্রাণের জীবনালেখ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা এ সত্যটুকুই নি:শেষে পেয়ে থাকি।

৪.ক. আদর্শের সূত্র-সমন্বয়

রংগলাল সেনের আদর্শিক জীবনের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, সকল আদর্শই একটি সরলরেখায় মিলিত হয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি-সর্বত্রই তাঁকে পাওয়া যায় একজন কঠোর নীতিসাধক হিসেবে। আদর্শের প্রশ্নে কখনো কোন ছাড় তিনি দেন নি, যার কেন্দ্রস্থলে সমাসীন ছিল সততা ও ন্যায়পরায়ণতা। তিনি বলতেন, একজন ভাল মানুষই হতে পারে ভাল শিক্ষক, ভাল রাজনীতিক, ভাল ব্যবসায়ী, ভাল বাবা,

ভাল মা, ভাল স্বামী, ভাল স্ত্রী ইত্যাদি। ভাল মানুষ অথচ শিক্ষক হিসেবে ভাল নন, অথবা ভাল শিক্ষক অথচ মানুষ হিসেবে ভাল নন, রংগলাল সেনের কাছে এসব ছিল নিতান্তই অকল্পনীয় বিষয়।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য নানাবিধ তৎপরতা ও সংগ্রামে আজ সর্বএই মহা আয়োজন দেখা যাচ্ছে। দেশের গণতন্ত্র, জাতির গণতন্ত্র, দলের গণতন্ত্র-, গোষ্ঠীর গণতন্ত্র- এসব বিভিন্ন আস্তরণে গণতন্ত্রকে চিত্রিত করে পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের প্রচেষ্ঠা বিশেষত রাজনৈতিক অঙ্গনকে মুখরিত করে রেখেছে। কিন্তু গণতন্ত্র আবাদের মূল ক্ষেত্র যে ব্যক্তিমানস, মাটি নয়, ভৌগোলিক কোন এলাকা নয়, একথা আমরা অনেকেই অনেক সময় ভুলে যাই। ধর্মচর্চার ক্ষেত্রেও এ কথাটি সমভাবে প্রযোজ্য। পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণনের মতে, "We must cultivate democracy as a state of mind, a style of life. A world brotherhood can be born only by the achievement of community with ourselves. Here is the task for religion."[১৮] আসলে মানবাচরণের সকল ক্ষেত্রেই মনস্তত্ত্বের বিরাট সংযোগ রয়েছে। এ সংযোগের কার্যকারিতা উপলব্ধি ও প্রয়োগে যে যত বেশী সফল, মানব জীবনের প্রকৃত সফলতা তার তত বেশী। রংগলাল সেন এ বিবেচনায় একজন সফল ব্যক্তি ছিলেন।

অধ্যাপক সেনের রাজনৈতিক সমালোচনার প্রকাশ ছিল এমন যে সমালোচিত ব্যক্তিটি পাশে বসে থাকলেও রাগ করতে পারতেন না। তাঁর অসাধারণ উপস্থাপন ক্ষমতা ও তথ্যের অবতারণার কাছে যে কাউকে হার মানতে হত। এক্ষেত্রে মাঝে মাঝে তিনি রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানের নানা তত্ত্বের আশ্রয় নিতেন। আবার কখনো কখনো অন্যের যুক্তিও মেনে নিতেন- পরমতের প্রতি শ্রদ্ধায় সমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক মানসিকতার এ এক অপূর্ব প্রকাশ।

জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসেবে অধ্যাপনা ব্যতীত আর কোন উৎস তাঁর ছিল না। বিভিন্ন মহল থেকে আয়ের বিভিন্ন উৎসের প্রলোভনও তিনি পেয়েছিলেন, যা তিনি বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করেন। যুক্তরাজ্যে পি-এইচ ডি অধ্যয়নকালে এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের শিলং-এ স্থাপিত যুদ্ধ পরিচালনা বিষয়ক অফিসে তথ্য কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন শেষে অনেকে তাঁকে দেশে না ফেরার পরামর্শ দেন। অধ্যাপক সেন দেশমাতৃকার টানে এসব পরামর্শও প্রত্যাখ্যান করে দেশপ্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। আর্থিক সীমাবদ্ধতা তাঁকে কখনো হতোদ্যম করে নি, চলার পথে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের হিন্দু সমাজের জাতিবর্ণ ব্যবস্থাকে তিনি অবাস্তব, অপরিণামদর্শী ও সমাজের জন্য আত্মঘাতী বলে অভিহিত করতেন। তাঁর বিভিন্ন লেখা ও আলাপচারিতায় তাঁর এ সংক্রান্ত শক্ত অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাই নয়, তিনি এর বাস্তব প্রমাণও রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁর সন্তানদের আন্তঃবর্ণ বিয়ে সম্পাদনের মাধ্যমে। তাঁর নিজের বেলায়ও একই বিষয় ঘটেছিল। কতটুকু উদার মনের অধিকারী হলে তা সম্ভব, তা ভাবতেও অবাক লাগে। আমার নিজের বিয়ের জন্য পাত্রী অনুসন্ধানে স্ববর্ণ ত্যাগ না করার পক্ষে মত পোষণ করায় তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাধারণ মানুষের প্রতি ড. সেনের ভালবাসার ছিল এক নিরন্তর টান। এসব সাধারণ মানুষ যারা মূলগতভাবে সমাজের গঠন প্রক্রিয়ার নেপথ্য কুশীলব, তারা কদাচিৎ কোন আলোচনায় স্থান পায়। এ কে নাজমুল করিম চলমান ইতিহাস চর্চায় সাধারণ মানুষকে অবজ্ঞার সমালোচনা করে সমাজ গবেষকদের এ কাজে আত্মনিয়োগ করার পরামর্শ দেন। তাঁর ভাষায়, " .. a great wealth of materials about Indian history was discovered, but in such detailed 'stories of kings, courts and conquests', the social history of the people was practically lost. The sociologist of today can fruitfully utilize these materials for building up a real social

history of India and Pakistan."[১৯] শিক্ষকের এহেন নির্দেশনা রংগলাল সেন মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয়। তাইতো সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় তিনি প্রধানত: ঐতিহাসিক পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেন, যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় মানুষ ও মানুষের পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া-সঞ্জাত সমাজকাঠামো। সুবিখ্যাত সামাজিক ইতিহাসবিদ ইরফান হাবিব 'ভারতবর্ষের মানুষের ইতিহাস'[২০] নামে যে ৪ খণ্ডের গ্রন্থমালা প্রকাশ করেন, তা এহেন প্রচেষ্টার এক জ্বাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

৪.খ. আদর্শের বিতরণ পদ্ধতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য স্যার ফিলিপ জোসেফ হারটগ (১৮৬৪-১৯৪৭) শিক্ষার দু'টি দিক অবলোকন করেন; যথা- বিদ্যায়তনিক (education for technical efficiency) ও সাংস্কৃতিক (education for culture)। তিনি মনে করেন যে, একজন ব্যক্তির সামাজিক উপযুক্ততা বিনির্মাণে এ দু'য়ের ভূমিকা সমভাবে ক্রিয়াশীল।[২১] আমরা এ দু'টি দিককে শিক্ষার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিকরূপে ধরে নিয়ে বলতে পারি যে, শিক্ষার্থী তার অধীত শাস্ত্র থেকে অর্জিত জ্ঞান এবং সমাজে এর সুষ্ঠু প্রয়োগের ওপর শিক্ষার্থী ও সমাজ উভয়ের লাভালাভ নির্ভরশীল। রংগলাল সেনের শিক্ষার্জন ও বিতরণে উপাচার্য মহোদয়ের মূল্যবান উপলব্ধিটি সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়েছিল।

'শিক্ষকও প্রতিনিয়ত পরীক্ষা দিয়ে চলছেন- তার পরীক্ষার মূল বিষয় হল সর্বদা নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চলা, যাতে করে শিক্ষার্থীর মেধার সুষ্ঠু মূল্যায়ন সুনিশ্চিত হতে পারে'- কথাটি সমাজবিজ্ঞানী নাজমুল করিম প্রায়শই উচ্চারণ করতেন বলে আমাকে জানান রংগলাল সেন। শিক্ষকের নির্দেশিত আদর্শটি ড. সেন আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন বলেই সকল মহলে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল ঈর্ষনীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, ছাত্র, কর্মকর্তা, কর্মচারী- সকল স্তরেই নানামুখী সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা রয়েছে এবং এসব সংগঠন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক শক্তি ও আদর্শের সাথে যুক্ত। রংগলাল সেন নিজেও একটি আদর্শের অনুসারী ছিলেন। তথাপি শিক্ষক হিসেবে তিনি কখনো কোনরূপ আপন-পর বিবেচনায় প্রবৃত্ত হন নি। অর্থাৎ, কাউকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি কখনো আদর্শের দোলাচলে আবর্তিত হয়ে পড়েন নি। তাঁর কাছে ছাত্রের পরিচয় ছিল শুধুই ছাত্র, সহকর্মী মানে সহকর্মী। তাই দেখেছি, ড. সেনের বিভাগীয় অফিস কক্ষে দল মত নির্বিশেষে সকলের যাতায়াত ছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রংগলাল সেনের কর্মজীবন ও আমাদের ছাত্রজীবনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তির ব্যাপারটি ছিল সমসাময়িক। আবেগ প্রকাশ করে তিনি লিখেছেন, "উক্ত পরীক্ষার্থীরা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে আমার সক্রিয় কর্মজীবনের সর্বশেষ ব্যাচ। এদের সান্নিধ্য আমি অপার আনন্দ-অনুভূতির মধ্য দিয়ে উপভোগ করেছি। মনে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এদের বিদায়ের সাথে আমার অবসর জীবনের সূচনা লগ্নের রয়েছে এক নিগূঢ় সম্পর্ক।"[২২] বিশ্ববিদ্যলয়ের একাডেমিক কমিটির সুপারিশে পরবর্তী ৫ বছর তিনি অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করেন। বিভাগীয় অফিসে মাঝে মাঝেই বিভিন্ন সংগঠনের ছাত্রনেতা স্যারের সাথে দেখা করতে আসতেন। আমি এক কোণে বসে থাকতাম। ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্র মৈত্রী, ছাত্রফ্রন্ট প্রভৃতি নানা সংগঠনের নেতাকর্মীদের কাছে তাঁর বার্তা ছিল একই ধরনের:

- সবার আগে ভাল মানুষ হতে হবে
- অন্যকে নিজের মত করে দেখতে হবে
- মানুষের মূল প্রয়োজনগুলো অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে
- মানুষের মধ্যে অযৌক্তিক ভেদাভেদ সৃষ্টি না করে সর্বোচ্চ সমরূপতা অঙ্কন করতে হবে

- সমাজের সকলের কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে
- তবেই যেকোন আদর্শ বা অবস্থান থেকে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য কাজ করা সম্ভব।

ড. সেনের বিভিন্ন লেখা খুঁজলেও এসব মূল্যবান কথা পাওয়া যাবে। তিনি বিশ্বাস করতেন, সকল দলেই ভাল মানুষ আছেন যারা প্রকৃত অর্থেই দেশের কল্যাণে কাজ করছেন। তাই রাজনৈতিক বা দলীয় পরিচয় দিয়ে কাউকে সঠিকভাবে বিচার করা যায় না। বিপরীত আদর্শের কাউকে কাউকেও তিনি 'ভাল মানুষ' বলতে শুনেছি। তিনি বলতেন, 'শিক্ষকরা হলেন সমাজ গড়ার কারিগর বা প্রকৌশলী, এখানে কোন প্রকার ভ্রান্তি থাকলে তা সম্পূর্ণ সমাজকে নেতিবাচকতার দিকে ধাবিত করবে'। মোট কথা, কোন ছাত্রছাত্রী যেন ভুল পথে চলে না যায়, সেদিকে তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্ঠার কোন ঘাটতি ছিল না। চিন্তা-চেতনায় পার্থক্য থাকলেও চূড়ান্ত লক্ষ্যে সুশিক্ষিত ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তি মাত্রেরই অভিন্নতা রয়েছে; অন্তত থাকা উচিত। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকআইভার এ সম্পর্কে বলেন, "ঐক্যের সন্ধানে অবশেষে আমরা ব্যক্তির কাছে যেতে পারি। যেখানে অনেক অনৈক্য ও দ্বন্দ্ব আবিস্কার করে সেখানেও ঐক্য খুঁজে পেতে পারি। এ ঐক্য নিহিত থাকে প্রত্যেকের আত্মসন্ধানের মধ্যে এবং প্রত্যেকের প্রিয় লক্ষ্য অর্জনের মধ্যে। আমরা এর সন্ধান পাই আত্মসমর্পণের মধ্যে নয়, বরং ব্যক্তিত্ব বিকাশের মধ্যে। কোন বন্ধন বা চাপিয়ে দেওয়া ব্যবস্থার মধ্যে নয়; বরং প্রত্যেক মানুষের আত্মসচেতন মননশীলতায়।"[২৩] এই আত্মসচেতন মননশীলতা সামনে রেখেই শিক্ষা বিতরণে ব্রতী হন ড. সেন।

শ্রেণীকক্ষের পাঠদানেও ড. সেনের অনুরূপ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য, তাঁর পাঠদানের একটি বিশেষ পদ্ধতি ছিল; তা হচ্ছে, তিনি অধ্যায়ে প্রবেশের পূর্বেই অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রচুর তথ্য, এর শিক্ষণীয় দিকসমূহ এবং বিষয়-সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের তালিকা উপস্থাপন করতেন। ফলে শিক্ষার্থীর কাছে পাঠের বিষয়বস্তু সহজতর হয়ে উঠত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, "ঘুরিয়া ফিরিয়া যেমন করিয়াই চলি না কেন, শেষকালে এই অলঙ্ঘ্য সত্যে আসিয়া ঠেকিতেই হয় যে, শিক্ষকের দ্বারাই শিক্ষাবিধান হয়, প্রণালীর দ্বারা হয় না"[২৪]- কথাটি রংগলাল সেনের শিক্ষাদানের মধ্যে স্পষ্টভাবে খুঁজে পাওয়া যায়।

রাজনৈতিক মঞ্চেও আমি তাঁর একাধিক বক্তৃতা শুনেছি। তিনি উত্তেজিত হতেন না, আক্রমণাত্মক কথা বলতেন না, চলমান সমস্যা উপস্থাপন করে এর সমাধানে করণীয় সম্পর্কে সহজ-সরল ভাষায় পরামর্শমূলক কথা বলতেন। উল্লেখ করা আবশ্যক যে, তিনি এসব বক্তব্যে সংশ্লিষ্ট এমন কিছু তথ্যের সমাবেশ ঘটাতেন, যা শোনার জন্য ভিন্ন সংগঠনের সমর্থকও উপস্থিত হতেন, নীরবে শুনতেন।

৫. আদর্শের পরম্পরা

রংগলাল সেনের আদর্শিক চেতনার ভিত রচনায় প্রতিষ্ঠানসম ক'জন ব্যক্তিত্বের ভূমিকা অবশ্য স্মর্তব্য। সুপ্রসন্ন ভাগ্যের অধিকারী রংগলাল সেন জীবনে এমন সব মহান ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তাঁদের আদর্শ এমনভাবে গ্রহণ ও ধারণ করেন, যাতে করে তাঁর আদর্শরেখায় কখনো ছেদ পড়েনি। ঐ শ্রদ্ধেয়জনের সংক্ষিপ্ত ব্যক্তি পরিচিতি তুলে ধরলে আমাদের আলোচনা বাস্তবমুখী হয়ে উঠবে; যাদের মধ্যে রয়েছেন বাবা রমন চন্দ্র সেন ও মা গিরিবালা সেন, গৃহশিক্ষক নরেশ চন্দ্র দাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পরে সহকর্মী অধ্যাপক গোবিন্দ চন্দ্র দেব, অধ্যাপক এ কে নাজমুল করিম, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা এবং সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টম বি বটোমোর (পি-এইচ ডি'র সুপারভাইজার)। উল্লেখ্য,

বর্ণিত গুণী ব্যক্তিবর্গের কথা আমি স্বয়ং অধ্যাপক সেনের কাছেই বার বার শুনেছি। আর, সমাজবিজ্ঞানী ও অন্যান্য পরিমণ্ডলের কতিপয় মনীষীর প্রভাবও তাঁর ব্যক্তিত্বের ভেতর লক্ষ্য করা যায়। আর, পরবর্তীতে তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে এহেন আদর্শের অবস্থান কেমন রয়েছে, তারও অল্প আলোচনা সন্নিবেশিত হবে।

৫.ক. বাবা রমন চন্দ্র সেন ও মা গিরিবালা সেন তথা পারিবারিক পরিচয়

রংগলাল সেনের বাবা শ্রী রমন চন্দ্র সেন কর্মজীবন শুরু করেন মোক্তার হিসেবে। পারিবারিক দায়-দায়িত্বের কথা বিবেচনায় রেখে এ পেশায় তিনি বেশীদিন থাকতে পারেন নি। গ্রামের বাড়ীর পাশে অবস্থিত আজমনি মাধ্যমিক ইংরেজী বিদ্যালয় ও আখাইলকুরা মাদ্রাসায় পর পর শিক্ষকতা করেন। তিনি দু'বার স্থানীয় ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যও ছিলেন। মা শ্রী গিরিবালা সেন ছিলেন গৃহিণী। পরিবারের সম্পূর্ণ দেখভাল করার পাশাপাশি ছেলে-মেয়ের লেখাপড়া ও মননশীলতার সুষ্ঠ বিকাশে ছিল তার কঠোর অনুশাসন। ঠিক সময়ে খাওয়া, পড়তে বসা, স্কুলে যাওয়া-আসা, ঘুমানো ও ঘুম থেকে ওঠা, খেলাধুলা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সজাগ। তাঁদের ১০ সন্তানের মধ্যে ৪ জন শৈশবেই মারা যান। বাকী ৬ জনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রোহিণীকান্ত সেন (প্রয়াত) ছিলেন স্থানীয় মনুমুখ উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক; দ্বিতীয় রংগলাল সেন; তৃতীয় ও চতুর্থ ২ বোন, যথাক্রমে সুসঙ্গিনী সেন দেব ও মহামায়া সেন। তাঁরা সুশিক্ষিতা হলেও কোন চাকুরীতে যোগ দেন নি, গৃহিণী হিসেবেই জীবনযাপন করে প্রয়াত হয়েছেন। পঞ্চম বঙ্কিম চন্দ্র সেন (প্রয়াত) ছিলেন নিজ জেলা শহরের নাম করা চিকিৎসক (এমবিবিএস); কনিষ্ঠ পীযূষ কান্তি সেন আইনজীবী হিসেবে সুখ্যাতি নিয়ে মৌলভীবাজার জজ কোর্টে কাজ করছেন।

রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিবেচনা করলে সেন পরিবারের এক উজ্জ্বল অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। বাবা ও বড় ভাই মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলন ও কংগ্রেসের স্থানীয় সংগঠক ছিলেন। দেশ বিভাগের পর গোটা পরিবার সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন এবং ক্রমশ: বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্বে আসীন হন। সুশিক্ষিত পরিবার হিসেবে গোটা এলাকায় তাঁদের একটি অনন্য সামাজিক অবস্থানও ছিল।

৫.খ. নরেশ চন্দ্র দাস

সেন পরিবারের গৃহশিক্ষকশ্রী নরেশ চন্দ্র দাস ছিলেন মৌলভীবাজার জেলা শহরের নিকট-পশ্চিমে অবস্থিত ঘড়ুয়া গ্রামের অধিবাসী। নরেশ পণ্ডিত নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন। তাঁর গ্রামের বাড়ীটি তৎকালে 'পণ্ডিত বাড়ী' বলে খ্যাত ছিল। তিন পুরুষ ধরে পাণ্ডিত্য তথা শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন তাঁরা। নরেশ পণ্ডিতের বাবা কৈলাস পণ্ডিত শহরের তৎকালে সুবিখ্যাত শ্রীনাথ মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। দুই কাকা সারদা চরণ ও অন্নদা চরণ এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের মহতী উদ্দেশ্যে নিজ বাড়ীতে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই দু'জন অভাগা (!) শিক্ষক তাঁদের উদ্যোগের চরম দক্ষিণাও পেয়েছিলেন- ১৯৭১ সনে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে তাঁদের ক'জন ছাত্রের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও নির্দেশনায় নিজ বাড়ীতে অগ্নিদগ্ধ ও গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিতে হয়েছিল তাঁদেরকে।[২৫]

সেন পরিবারের বাড়ীর নিকটবর্তী বাসুদেবশ্রী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন নরেশ পণ্ডিত। তাঁর আবাসিক ব্যবস্থার দায়িত্ব নেন দক্ষিণ পৈলভাগ (রামেরগাঁও)-এর অধিবাসী ও ৩ নং কামালপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য শ্রী কৃপেশ চন্দ্র দেব। হাতে খড়ি ছাড়াও নরেশ পণ্ডিত বহুদিন ধরে সেন পরিবারের তৎকালীন ছাত্রদের পড়িয়েছেন। অত্যন্ত মেধাবী, নীতিনিষ্ঠ, সুশৃঙ্খল ও আদর্শবান শিক্ষক হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল। সেন পরিবারে

তখন প্রায়ই স্থানীয় জ্ঞানীগুণীদের আড্ডা বসত, যেখানে পণ্ডিত মশাই ছিলেন প্রধান আকর্ষণ। ভোজনবিলাসী হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। প্রতিভাবান ছাত্র বলে রংগলাল সেনকে তিনি অতিশয় স্নেহ করতেন।

৫.গ. গোবিন্দ চন্দ্র দেব

দর্শনশাস্ত্রের সুপণ্ডিত, দর্শনসাগর উপাধিপ্রাপ্ত এবং মরণোত্তর একুশে পদক (১৯৮৫) ও স্বাধীনতা পুরস্কার (২০০৮) প্রাপ্ত ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব পুরকায়স্থ (১৯০৭-১৯৭১) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার লাউতা গ্রামে জন্মগ্রহণকারী ড. দেবের পূর্বপুরুষরা ভারতের গুজরাট থেকে এখানে এসে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। স্বর্ণোজ্জ্বল কৃতিত্বের অধিকারী এই মহান ব্যক্তি জি সি দেব নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। কলকাতার সংস্কৃত কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। কলকাতার রিপন কলেজের শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে ১৯৫৩ সনে যোগ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে। উক্ত বিভাগের চেয়ারম্যান ছাড়াও তিনি ঢাকা হল (বর্তমানে শহীদুল্লাহ হল)-এর হাউজ টিউটর ও পরবর্তীতে জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি নয়টি মূল্যবান গ্রন্থের প্রণেতা, যা আজও অভিজ্ঞমহলে সমাদৃত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নামে শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে নরপিশাচ পাক হানাদার বাহিনী ও এদের এদেশীয় দালালদের পরিকল্পিত আক্রমণের শিকার হয়ে ২৫শে মার্চের কালোরাতে অকৃতদার এই মনীষীর জীবনাবসান ঘটে।

৫.ঘ. এ কে নাজমুল করিম

অধ্যাপক ড. আবুল খায়ের নাজমুল করিম (১৯২২-১৯৮২) বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন ১৯৫৭ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র বিভাগ চালু করার মাধ্যমে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কৃতিত্বের সাথে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জনের পর ড. করিম তদানীন্তন সরকারের বৃত্তি নিয়ে আমেরিকার কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরকার ও সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে আলাদাভাবে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নেন। পরে রকফেলার বৃত্তি নিয়ে লণ্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স থেকে পি-এইচ ডি ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। ফেনী কলেজের প্রভাষক হিসেবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। ঢাকা কলেজেও তিনি একই পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও পরে সমাজবিজ্ঞান বিভাগে যোগদান করেন।

লক্ষীপুরে জন্মগ্রহণকারী ড. করিমের পৈতৃক নিবাস কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের ফাল্গুনকরা গ্রামে। সমাজবিজ্ঞানের ওপর তিনি ক'টি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১২ সনে মরণোত্তর একুশে পদক প্রদান করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নামে শিক্ষা কেন্দ্র ও বৃত্তি চালু রয়েছে। তিন কন্যা সন্তানের জনক ড. করিমের স্ত্রী সৈয়দা জাহানারা বেগম ঢাকার বদরুন্নেসা কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

৫.ঙ. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক ও জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা (১৯২০-১৯৭১) মহোদয়ের জন্ম ময়মনসিংহ শহরে। পৈতৃক নিবাস বরিশালের বানারীপাড়ায়। বাবা ও মা উভয়েই শিক্ষক হিসেবে ময়মনসিংহে কর্মরত ছিলেন। তাঁর শিক্ষাজীবন ছিল খুবই কৃতিত্বপূর্ণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগ থেকে তিনি স্নাতক

ও স্নাতকোত্তর উভয় পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেন। স্নাতকে দর্শনশাস্ত্রে রেকর্ড পরিমাণ নম্বর পাওয়ায় তাঁকে পোপ মেমোরিয়াল গোল্ড মেডাল প্রদান করা হয়। বৃটিশ কাউন্সিলের বৃত্তি নিয়ে লণ্ডনের কিংস কলেজ থেকে তিনি পি-এইচ ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে তিনি কিশোরগঞ্জের গুরুদয়াল কলেজ, ময়মনসিংহের আনন্দ মোহন কলেজ ও ঢাকার জগন্নাথ কলেজে শিক্ষকতা করেন। শিক্ষক ছাড়াও তিনি প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক ও যুক্তিবাদী সমাজচিন্তক, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পৃষ্ঠপোষক রূপে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন।

তাঁর স্ত্রী বাসন্তী গুহঠাকুরতা ছিলেন পুরানো ঢাকার গেণ্ডারিয়ায় অবস্থিত মনিজা রহমান বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা। তাঁদের একমাত্র সন্তান ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পালন শেষে বর্তমানে মানবাধিকার এবং সামাজিক গবেষণা ও উন্নয়ন নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুদক্ষভাবে কাজ করছেন।

১৯৭১ সনের ২৫ মার্চের কালোরাতে তিনি বর্বর পাক হানাদার বাহিনীর গোলার আঘাতে গুরুতর আহত হন ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৩০ মার্চ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

৫.চ. টম বি বটোমোর

বৃটিশ মার্কসবাদী সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক টম বি বটোমোর (১৯২০-১৯৯২) সমাজ গবেষক হিসেবে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন। লণ্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স থেকে তিনি সমাজবিজ্ঞানে স্নাতক ও অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। যশস্বী সমাজবিজ্ঞানী মরিস জিন্সবার্গের অধীনে তিনি গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেন। কর্মজীবনে তিনি যুক্তরাজ্যের লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ও সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয় এবং কানাডার সাইমন ফ্রেসার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। তিনি ১৯৫৩-১৯৫৯ মেয়াদে *International Sociological Association*- এর নির্বাহী সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৭০-১৯৭৮ মেয়াদে উক্ত সংস্থার সভাপতি নির্বাচিত হন। *British Sociological Association*- এর সভাপতিও ছিলেন তিনি (১৯৬৯-১৯৭১)। রাজনীতি সচেতন বটোমোর বৃটিশ লেবার পার্টির সদস্য ছিলেন।

২০টি মূল্যবান গ্রন্থের প্রণেতা বটোমোর সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে অসংখ্য জার্নাল সম্পাদনা করেন। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে সারা বিশ্বের সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের পরিমণ্ডলে বহুল পঠিত ক'টি হলঃ *Classes in Modern Society* (1955), *Marx: Selected Writings in Sociology & Social Philosophy* (1956), *Sociology: A Guide to Problems and Literature* (1962), *Elites and Society* (1966), *Sociology as Social Criticism* (1975), *Marxist Sociology* (1975), *A History of Sociological Analysis* (1979), *A Dictionary of Marxist Thought* (1983), *Sociology and Socialism* (1984), *The Capitalist Class: An International Study* (1989) প্রভৃতি।

যেসব ব্যক্তিত্বের কথা আমরা আলোচনা করলাম, তাঁদের কর্মক্ষেত্র ও কৃতিত্বের সামনে-পেছনে যে অনির্বাণ আলোকশিখা জ্বলজ্বল করছিল, তা হলো সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা-প্রসূত জ্ঞান। জ্ঞানগুরু সক্রেটিসের 'সদগুণই জ্ঞান'[২৬] এই ক্ষুদ্র অথচ মহামূল্যবান বাণীতে তারা সর্বদা অবিচল ছিলেন। আর রংগলাল সেনের আদর্শিক ভিত রচিত হওয়ার প্রধান অনুঘটক-সূত্র এখানেই গ্রথিত।

৫.ছ. স্ত্রী, উত্তরাধিকারীগণ ও আদর্শিক চেতনার ধারাবাহিকতা

অধ্যাপক রংগলাল সেনের স্ত্রী কমলা সেন (১৯৪২-২০১৮) ছিলেন সর্বগুণে গুণান্বিতা এক মহিয়সী নারী। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করে উক্ত ক্যাম্পাসে অবস্থিত উদয়ন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। এর আগে তিনি ঢাকার নারী শিক্ষা মন্দির (বর্তমান নাম শেরে বাংলা বালিকা বিদ্যালয়) ও টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুরের ভারতেশ্বরী হোমসের শিক্ষক ছিলেন। ১৯৬৬ সনের ২৫ ফেব্রুয়ারী তাঁদের বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল। আমি একটু ঘন ঘন তাঁদের বাসায় যেতাম। মাসীমা দরজা খুলেই বলতেন, 'আমার বাবুল আইছে'; শব্দগুলো আজও আমার কানে বাজে। সেন দম্পতির সন্তান তিনজন, যাদের সকলেই অত্যন্ত মেধার স্বাক্ষর রেখে শিক্ষাজীবন সম্পন্ন করে কর্মজীবন চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রথমজন সূচনা সেন পাপড়ি, পেশায় চিকিৎসক, চট্টগ্রামে একটি বেসরকারী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। তাঁর স্বামী শিব শঙ্কর সাহা চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ও বিশেষজ্ঞ সার্জন। তাঁরা তিন সন্তানের জনক-জননী। দ্বিতীয়জন রচনা সেন পাপিয়া, তাঁর স্বামী মানস মৈত্র। দু'জনেই প্রকৌশলী হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরিজোনায় একটি কম্পিউটার কোম্পানীতে কর্মরত। তাঁরা দু'সন্তানের জনক-জননী। তৃতীয়জন সত্যকাম সেন পরাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তা হিসেবে সরকারের যুগ্ম সচিবের দায়িত্বে কর্মরত। তাঁর স্ত্রী দীপালী বকশী সেন ঢাকার একটি স্কুলের শিক্ষক, তিনি উদ্ভিদবিজ্ঞানে স্নাতক (সম্মান) ও স্নতকোত্তর ডিগ্রীধারী। তাঁরা দু'সন্তানের জনক-জননী। পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি পিতার আদর্শিক চেতনা তাঁরা অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে লালন করে চলেছেন। মানুষের আদর্শিক ও জ্ঞানভিত্তিক চেতনা তৈরীর একটি বংশগত ধারাবাহিকতা প্রয়োজন হয়, নোবেল বিজয়ী বাঙ্গালী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের পারিবারিক উত্তরাধিকারের প্রসঙ্গ টেনে ড. সেন এ মন্তব্য করতেন। তা ছাড়া, রংগলাল সেনের ভাই-বোন ও অনেক আত্মীয়-স্বজনের পরিবারের সাথে আমার ঘনিষ্ট পরিচয় ও যোগাযোগ রয়েছে, যাদের আদর্শিক চেতনা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা প্রশংসনীয়।

৬. শিক্ষা

শিক্ষা প্রত্যয়টি উদ্ভাবিত না হলে সভ্যতা হয়ত সমাজকাঠামোয় এত সুদৃঢ় স্থান লাভ করতে পারত না। আজকাল বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কলা, বাণিজ্য ও শিল্পের অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে মানব সভ্যতার চরম উৎকর্ষের যে ঘন্টাধ্বনি দিকে-দিগন্তে নিনাদিত হচ্ছে, তা শিক্ষার আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা এখন ড. সেনের অধীত শাস্ত্র সমাজবিজ্ঞানের আলোকে শিক্ষার প্রকৃতি অনুসন্ধানের চেষ্টা করব। আমরা মনে করি, তাঁর আদর্শিক মানসলোক গঠনের পটভূমিকায় এই আলোচনা একেবারেই প্রাসঙ্গিক।

৬.ক. শিক্ষা প্রত্যয়টি স্বভাবজাত ও স্বত:স্ফূর্ত

বস্তুত মানুষের সৃজনশীলতার অনন্য গুণটিই গোটা জগৎকে গতিময় করে তুলেছে; যেখানে বাধা পেয়েছে, সেখানে উত্তরণের প্রয়াস চালিয়েছে। অর্থাৎ, মানুষের জীবনকে অবাধ ও সুষমামণ্ডিত করার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণে মানুষকে সর্বদাই তৎপর থাকতে দেখা যায়। বিশ্বব্যাপী মহামারী কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে মানুষ তার স্বভাবসুলভ সে প্রচেষ্টা চালিয়ে সফলকাম হয়েছে এবং ইতোপূর্বে ক্যান্সার, যক্ষা, ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মানব সমাজকে বাঁচানোর উদ্যোগে সুফল অর্জন করেছে। আধুনিক যুগেই নয়, সভ্যতার উষালগ্নেও মানুষ নানা ধরনের বাধা-বিপত্তি জয় করার তৎপরতা চালিয়েছে, আমরা যাদেরকে বর্বর বলে উপহাস করি! জীবন ধারণের মূল উপাদান খাদ্য (এমনকি অখাদ্য) সামগ্রী সহ

অনেক আবশ্যকীয় বিষয় নিরূপণ করেছেন ঐসব ববর্ররাই, আবিষ্কারক বা উদ্ভাবকের উপাধি তারা কখনো চায় নি, পায় নি। নৈতিকতাবাদী সমাজ-দার্শনিক এডাম ফার্গুসন এজন্যই আদিম সমাজের সমীক্ষায় কল্পনাবিলাসের পরিবর্তে তথ্যনির্ভরতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, "আদিম সমাজের মানুষকে অসভ্য-বর্বর বলা বিজ্ঞানসম্মত নয়। কেননা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয় যে, যাদেরকে আমরা বর্বর বলতে অভ্যস্ত তারা আমাদের মত সভ্যদের চেয়ে খুব একটা ভিন্ন নয়।"[২৭]

মানুষের সৃজনী প্রতিভার অনন্য অনুসন্ধানী রবীন্দ্রনাধ ঠাকুর এ প্রসঙ্গে বলেন, "সৃষ্টিকর্তার জীবরচনা পরীক্ষায় মানুষের সম্বন্ধে হঠাৎ খুব একটা সাহস দেখতে পাওয়া যায়। তিনি তার অন্ত:করণকে বাধা দিলেন না। বাহিরে প্রাণীটিকে সর্বপ্রকারে বিবস্ত্র নিরস্ত্র দুর্বল করে এর অন্ত:করণকে ছেড়ে দেওয়া হল। এই মুক্তি পাওয়ার আনন্দে সে বলে উঠল 'আমি অসাধ্য সাধন করব'। অর্থাৎ 'যা চিরদিন হয়ে আসছে তাই যে চিরদিন হতে থাকবে সে আমি সইব না, যা হয় না তাও হবে'। সেইজন্যে মানুষ তার প্রথম যুগে যখন চারদিকে অতিকায় জন্তুদের বিকট নখদন্তের মাঝখানে পড়ে গেল তখন সে হরিণের মত পালাতে চাইল না, কচ্ছপের মত লুকোতে চাইল না, সে অসাধ্য সাধন করলে- চকমকি পাথর কেটে ভীষণতর নখদন্তের সৃষ্টি করলে।"[২৮] ভাষাহীন, বুদ্ধিহীন বলে বিবেচিত অনুজীব থেকে শুরু করে বিকট জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেও আত্মরক্ষার নানা কৌশল আত্মস্থ করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষ তো বটেই, প্রাণীমাত্রই জীবনকে ঝঞ্ঝাটমুক্ত ও নিরাপদ করার জন্য পূর্বসূরীদের নিকট থেকে প্রাকৃতিক উপায়ে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।

৬.খ. শিক্ষার ধরন

শিক্ষা অর্জন ও বিতরণের নানাবিধ ধরন রয়েছে। তবে এসব ধরনকে মোটামোটি তিনটি প্রধান বিভাগের অধীনে বিন্যস্ত করা যায়।

প্রথমত, প্রাতিষ্ঠানিক বা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গোটা শিক্ষাব্যবস্থার সর্বব্যাপী রূপ। বিশ্বের সর্বত্রই এ ধরনের শিক্ষার উপস্থিতি রয়েছে, যা প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়ে থাকে। এখানে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ রাষ্ট্রের আইন ও নৈতিকতা, প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, সামাজিক বাস্তবতা ও মূল্যবোধ, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় বিবেচনা করে শ্রেণী অনুযায়ী একটি পাঠক্রম নির্ধারণ করে দেয়। পাঠদানের জন্য নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানায় তৈরী করা হয় ভবন, যা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি নামে পরিচিত। সুশিক্ষিত ও উপযুক্ত একদল লোক নিয়োগ করা হয় আগত শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠ্যসূচী অনুযায়ী শিক্ষা বিতরণের জন্য। নির্ধারিত সময়-কাঠামো অনুসরণ করে শিক্ষা প্রদান ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা এখানে অবশ্য পালনীয় বিষয়। মূল্যায়ন শেষে মেধামান উল্লেখপূর্বক প্রত্যায়ন তথা সনদপত্র প্রদান করা হয়। পাঠদানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মননবৃত্তির বিকাশেও নানা কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত, অপ্রাতিষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাও মূলত সর্বব্যাপী শিক্ষাব্যবস্থা। পৃথিবীর তাবৎ শিক্ষাব্যবস্থার সূতিকাগার হল এটি। অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থাই মানুষকে ক্রমশ: প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পটভূমি রচনা করে দেয়। জীবন ধারণের অনেক মূল্যবান উপাদান ও তথ্য মানুষের কাছে ধরা দেয় অপ্রাতিষ্ঠানিক চর্চার মাধ্যমেই, যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে নেই কোন ভবন বা পাঠক্রম। নেই কোন সনদের ব্যবস্থা; তবে মূল্যায়নের একটি সুপ্ত ব্যবস্থা এখানে পরিলক্ষিত হয়। পরিবার, প্রকৃতি, সামাজিক ও নৈসর্গিক প্রতিবেশ, খেলার সাথী, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি সব কিছুই এখানে শিক্ষার আধার রূপে ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ, ধর্মীয় ও নৈতিক বিধি-বিধান, জীবন ধারণের উপায়, উপার্জনের

চলমান ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে মানুষের মধ্যে সর্বদাই মিথষ্ক্রিয়া সংঘটিত হয়ে থাকে। এগুলো মানুষের মধ্যে নানা বিশ্বাসের জন্ম দেয়, যা শিক্ষারূপে পরবর্তী জীবনে মানুষ কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। অর্থাৎ এখানে শিক্ষার বিষয়টি উন্মুক্ত- 'বিশ্বজোড়া পাঠশালা'[২৯]। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁর মামণি ইন্দিরাকে এ পদ্ধতিতে 'প্রকৃতির ভাষা'[৩০] উপলব্ধির মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের ওপর সবিশেষ জোর দিয়েছিলেন। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি এ শিক্ষা চলমান থাকে।

তৃতীয়ত, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যবর্তী ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এখানে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন অনুযায়ী পাঠক্রম ও সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। সাধারণত, রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিচালনা করে থাকেন।

৬.গ. শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

মানুষের সমাজ ও জীবনকে সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও অর্থবহ করে তোলাই শিক্ষার আসল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে মানুষ প্রতিনিয়ত শিক্ষা গ্রহণ করছে, শিক্ষার আধুনিকীকরণ ও যুগোপযোগীকরণেও তৎপর রয়েছে। সাথে সাথে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্বও সম্যক বিবেচনায় এসেছে। শিক্ষার অধিক্ষেত্র যাই হোক, চূড়ান্ত অর্থে মানুষকে যথাযথ মানবীয় গুণাবলীতে ঋদ্ধ করে সমাজের সংহতি তথা অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার মধ্যেই শিক্ষার সার কথা গ্রথিত। শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য উপলব্ধি করার জন্য আমরা ক'জন সমাজবিজ্ঞানী ও সমাজ দার্শনিকের বক্তব্য উপস্থাপন করতে চাই:

এরিস্টটল: সুস্থ দেহে সুস্থ মনের বিকাশের অপর নাম শিক্ষা। এটি বিশেষ করে মানুষের মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটায়, যার মাধ্যমে সে পরম সত্য, শিষ্ঠতা ও সৌন্দর্য্যের মহিমা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।[৩১]

জন লক: শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো মানসিক শৃঙ্খলা বিধান।[৩২]

জ্যাঁ জ্যাক রুশো: শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুর সহজাত প্রবৃত্তির বিকাশ সাধন।[৩৩]

অগাস্ট কোঁত: শিক্ষার লক্ষ্য শুধু বিদ্যাবুদ্ধির বিকাশ সাধন নয়; শিক্ষার্থীকে সমাজের সকল স্তরের মানুষের প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতির শিক্ষাও গ্রহণ করতে হবে। তিনি সার্বজনীন শিক্ষার ওপর জোর দেন।[৩৪]

হার্বার্ট স্পেন্সার: সমুদয় মানবীয় শক্তি বৈজ্ঞানিক শিক্ষার দ্বারা বর্ধিত হয়। ... বিজ্ঞানের তুল্য নম্রতা আর কেহই শিক্ষা দেয় না।[৩৬]

এমিল ডুর্খীম: শিক্ষার মাধ্যমে শিশুরা সামাজিক হয়। তিনি বিদ্যালয়কে গৃহের সাথে তুলনা করেন।[৩৬]

টি বি বটোমোর: শিশুদের সামাজিকীকরণ ও শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বিধান করাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।[৩৭]

চিন্তাবিদদের উল্লিখিত বক্তব্য থেকে আমরা সহজেই এ সামান্যীকরণে পৌছাতে পারি যে, একজন মানুষকে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী অর্জনই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য, যার ফলে সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, শিষ্ঠাচার, সৌন্দর্যানুরাগ, ভালবাসা ও সহানুভূতির সুসমন্বয় সাধিত হয়ে সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে। শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টিভঙ্গীর মূল্যায়ন করে শিক্ষাবিদ

খান সারওয়ার মুরশিদ যে মন্তব্য করেন, তার উল্লেখ করে প্রসঙ্গটির সমাপ্তি টানতে চাই: "শিক্ষার লক্ষ্য হবে মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ উন্মোচন, ব্যক্তির সকল শুভ সম্ভাবনার স্ফূরণ, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের যোগ, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যোগ, শিক্ষিত অশিক্ষিতের বৈষম্য বিমোচন, আত্মিক ও ব্যবহারিকের মধ্যে সমন্বয়, জ্ঞানবোধ কল্পনা ও সৌন্দর্য-চেতনার কর্ষণ ও বিকাশ, কর্মে জ্ঞানের নিয়োগের দ্বারা জীবনে সম্পন্নতা ও সমৃদ্ধি অর্জন, সৃজনশীলতার সাহায্যে মনুষ্যত্বের পরিচর্যা ও প্রসার।"[৩৮]

৬.ঘ. সামাজিকীকরণের আসল বাহন শিক্ষা

মানুষ সামাজিক জীব। বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে হরেক রকম রীতি-নীতি মান্য করে সমাজে বসবাস করে বিধায় অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্টত্ব প্রতিষ্টা পেয়েছে। বিবেক-বুদ্ধি অর্জন করে নিতে হয়, নতুবা নামান্তরে আমরা কেউ কেউ দেহসর্বস্ব প্রাণীই থেকে যাই। কাজী নজরুলের উপলব্ধি এখানে যোগ করার মত:

> সেরেফ পশুর ক্ষুধা নিয়া হেথা মিলে নরনারী যত
> সেই কামনার সন্তান মোরা! তবুও গর্ব কত।[৩৯]

মোদ্দা কথা, 'সমাজের মানুষ' হিসেবে যে গুণগুলো কোন একজনের চরিত্রে থাকা উচিৎ, সেগুলো অর্জন করতে পারার মধ্যেই মানুষ নামের শ্রেষ্টত্ব প্রমাণ করা যায়, গর্ব করা যায়। আর, এখানেই রয়েছে 'সামাজিকীকরণ' প্রত্যয়টির যথোপযুক্ত ভূমিকা। সমাজবিজ্ঞানী রংগলাল সেনের কথায়: "একটি মানবশিশু জৈবিক সত্তা হিসেবে প্রাণীর চাহিদা নিয়ে ভূমিষ্ট হয়। সে ক্রমশ: সামাজিক জীবে পরিণত হয়।"[৪০] যে প্রক্রিয়ায় মানবশিশু সামাজিক জীবরূপে আত্মপ্রকাশ করে, এটিই সামাজিকীকরণ। সামাজিক বিধিবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সমাজের সংহতি বজায় রাখা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য বলে বিবেচিত। তাই শৈশব থেকে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে এই প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল। মানুষের সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার সকল ক্ষেত্র তথা পরিবার, প্রতিবেশ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, জীবিকার আধারসমূহ, বিনোদনের মাধ্যমসমূহ, গণমাধ্যম, আইন, রাষ্ট্র প্রভৃতি সামাজিকীকরণের বাহনরূপে কাজ করে।

অধ্যাপক রংগলাল সেনের সার্বিক জীবনাচরণে সমাজবিজ্ঞানীদের নির্দেশিত শিক্ষাব্যবস্থা কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে, তা নিশ্চয়ই অভিজ্ঞ পাঠকমহলের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে।

৭. উপসংহার

রংগলাল সেনের অর্জিত শিক্ষা ও শিক্ষার প্রায়োগিক দিক নিয়ে আলোচনার শেষ পর্বে এসে আমরা তাঁকে একজন মানবতাবাদী সমাজবিজ্ঞানী, সমতাবাদী শিক্ষাবিদ ও নৈতিকতাবাদী মানবপ্রেমিক হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি। পারিবারিক আদর্শ, বিভিন্ন জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য ও অধীত শাস্ত্র সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষার সম্মিলিত প্রভাবে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার এমন এক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া লাভে সমর্থ হয়েছিলেন, যা তাঁকে শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন তথা সত্যাশ্রয়ী জ্ঞানের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করেছিল। শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজনীতি, নৈতিকতা প্রভৃতিতে তাঁর অবস্থান নির্ণয়ে নিম্নের বিপরীতমুখী দু'টি বক্তব্যই যথেষ্ট। প্রথমত, তিনি বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন (কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন, ১৯৭৪)-র প্রস্তাবনাসমূহের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, যেখানে বলা হয়: "একটি শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করতে হলে শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণীবৈষম্য দূর করে সুযোগ সুবিধার সমতা বিধান করতে হবে। পুরাতন শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষা প্রধানত: সমাজের

একটি ক্ষুদ্র সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর কুক্ষিগত হয়ে পড়েছিল। তার ফলে কৃষক, শ্রমিক ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর বৃহত্তর অংশের সন্তান-সন্ততিদের প্রতিভা বিকাশের পথে বিশাল অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছিল। .. সারা দেশে সামাজিক সংহতির প্রয়োজনে ও অগ্রগতির স্বার্থে দেশব্যাপী শিক্ষার মানের একটি মোটামোটি সমতা বিধান অপরিহার্য। পিতামাতার আর্থিক অবস্থা, বাসস্থান, ধর্ম, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ, বয়স প্রভৃতি কারণে যেন কারো প্রতিভার যথাযথ বিকাশ ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ ব্যাহত না হয় তা নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় সুনিশ্চিত করতে হবে।"[৪১] দ্বিতীয়ত, পাকিস্তান আমলের এস এম শরীফ শিক্ষা কমিশনের মুখবন্ধে বলা হয়েছিল: "শিক্ষা সম্পর্কে জনসাধারণের সনাতন ধারণা পাল্টাতে হবে। সস্তায় শিক্ষা লাভ করা যায় বলে যে তাদের ভুল ধারণা রয়েছে তা শিগগিরই বর্জন করতে হবে। যেমন দাম তেমন জিনিস- অর্থনীতির এ সূত্র অন্যান্য ব্যাপারে যেমন সত্য, তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রেও তা উপেক্ষা করা অসম্ভব।"[৪২] শিক্ষাকে পণ্য হিসেবে উপস্থাপনের এহেন হীন প্রয়াসকে ড. সেন আজীবন তীব্রভাবে বিরোধিতা করেছেন।

উল্লিখিত দু'টি বক্তব্য থেকে অধ্যাপক রংগলাল সেনের আদর্শিক চেতনার ভিত্তি মানবিকতাবোধের কত গভীরে গ্রথিত ছিল, তা অতি সহজেই অনুমেয়। শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি দান করে শৃঙ্খলিত জীবন থেকে সকল মানুষকে মুক্ত জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারলেই যেকোন নীতিমালার সার্থকতা প্রমাণিত হয়। এতে মানবাত্মার সত্য দর্শনের প্রক্রিয়াটির শুভ সূচনা ঘটতে পারে। আর এখানেই অনুধাবন করি রংগলাল সেনের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য।

তথ্যসূত্র

১. প্লেটো (সৈয়দ মকসুদ আলী অনূদিত), *রিপাবলিক*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩, পৃ. ১৭৭

২. জগদীশ চন্দ্র বসু, *অব্যক্ত*, কোলকাতা, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ১৩২৮ বাং, পৃ. ৯২

৩. সরদার ফজলুল করিম, 'হরিদাস ভট্টাচার্য: একজন শিক্ষকের আলেখ্য', রংগলাল সেন ও অন্যান্য (স.), *বাসন্তিকা*, ঢাকা, জগন্নাথ হল বার্ষিকী হীরক জয়ন্তী সংখ্যা, ১৯৮১, পৃ. ১৩৬

৪. জগন্নাথ হল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, *জাতীয় অধ্যাপক রংগলাল সেন সংবর্ধনা স্মরণিকা*, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১১

৫. এ কে নাজমুল করিম, *সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ*, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৪, পৃ. ১৬

৬. উদ্ধৃত, হারুন-অর-রশিদ, *৭ই মার্চের ভাষণ কেন বিশ্ব তিহ্য-সম্পদ: বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ*, ঢাকা, অন্যপ্রকাশ, ২০১৮, পৃ. ৬৮

৭. রংগলাল সেন, *সিভিল সোসাইটি*, ঢাকা, তপন প্রকাশন, ২০০৩, পৃ. ১৬৪

৮. রংগলাল সেন, *সিভিল সোসাইটি*, ঐ, পৃ. ১৬৫

৯. রংগলাল সেন, *সমাজকাঠামো: পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র*, ঢাকা, নিউ এজ পাবলিকেশনস, ২০০৪, পৃ. ৩০৮

১০. রংগলাল সেন, *বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস*, ঢাকা, নিউ এজ পাবলিকেশনস, ২০০৬, পৃ. ১১৮

১১. রংগলাল সেন ও বিশ্বম্ভর কুমার নাথ, *প্রারম্ভিক সমাজবিজ্ঞান*, ঢাকা, নিউ এজ পাবলিকেশনস, ২০০৮, পৃ. ৩২৩

১২. *Quoted in* S Radhakrishnan, *Religion and Society*, London, George Allen and Unwin Ltd., 1947, p. 91

১৩. রংগলাল সেন, *সিভিল সোসাইটি*, ঐ, পৃ. ২১১

১৪. *বিস্তারিত দেখুন, অনলাইন উইকিপিডিয়া*

১৫. *বিস্তারিত দেখুন, অনলাইন উইকিপিডিয়া*

১৬. রংগলাল সেন, *সমাজকাঠামো: পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র*, ঐ, পৃ. ৩৫১

১৭. মো: আনিসুর রহমান, *অপহৃত বাংলাদেশ*, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৩, পৃ, ১১৬

১৮. S Radhakrishnan, *op cit.*, p. 100

১৯. A K Nazmul Karim, *Changing Society in India, Pakistan and Bangladesh*, Dhaka, Nawroz Kitabistan, 1996, p. 9-10

২০. ইরফান হাবিব (কাবেরী বসু অনূদিত). *ভারতবর্ষের মানুষের ইতিহাস (৪ খণ্ড)*, কোলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০২- ২০০৬ (কৌতূহলী পাঠকদের জন্য রেফারেন্স হিসেবে উল্লিখিত)

২১. Sir P J Hartog, *Examinations and their Relation to Culture and Efficiency*, London, Constable and Company Ltd., 1918, p. xv (int.)

২২. আব্দুল মুহিত ও বাবুল চন্দ্র সূত্রধর (স:), *অম্লান স্মৃতি এলবাম*, ঢাকা, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ৩০ তম ব্যাচ, ১৯৯৪, ড. রংগলাল সেন প্রদত্ত শুভেচ্ছা বাণী

২৩. আর এম ম্যাকআইভার (এমাজ উদ্দীন আহমদ অনূদিত), *আধুনিক রাষ্ট্র*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ. ৪৪৫

২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *'শিক্ষাবিধি'*, পথের সঞ্চয়, কোলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৫৪ বাং, পৃ. ১৮৩

২৫. ডা: সুধেন্দু বিকাশ দাশ, *স্বাধীনতা ও মৌলভীবাজারের ঘড়ুয়া গ্রাম*, দৈনিক সিলেট মিরর, ১২ মে, ২০২০

২৬. রংগলাল সেন, *সিভিল সোসাইটি*, ঐ, পৃ. ১৫

২৭. দেখুন, রংগলাল সেন, *সিভিল সোসাইটি*, ঐ, পৃ. ৬

২৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *'সত্যের আহ্বান'*, কালান্তর, কোলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪১৬ বাং, পৃ. ১৯০-১৯১

২৯. কবি সুনির্মল বসু'র বিখ্যাত কবিতা *'সবার আমি ছাত্র'*

৩০. জওহরলাল নেহরু (হেনা চৌধুরী অনূদিত), *মা-মণিকে বাবা*, কলকাতা, পত্রপুট, ১৯৯৩, পৃ. ৩

৩১. রংগলাল সেন ও বিশ্বম্ভর কুমার নাথ, ঐ, পৃ. ৩০২

৩২. রংগলাল সেন ও বিশ্বম্ভর কুমার নাথ, ঐ, পৃ. ৩০৫

৩৩. রংগলাল সেন ও বিশ্বম্ভর কুমার নাথ, ঐ, পৃ. ৩০৫

৩৪. স্যামুয়েল কোনিগ (রংগলাল সেন অনূদিত), *সমাজবিজ্ঞান*, ঢাকা, জে কে প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস, ২০০২, পৃ. ১৩০

৩৫. হার্বার্ট স্পেন্সার (স্বামী বিবেকানন্দ অনূদিত), *শিক্ষা*, কোলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৮১, পৃ. ৪০ ও ৪৫

৩৬. স্যামুয়েল কোনিগ (রংগলাল সেন অনূদিত), ঐ, পৃ. ১৩১

৩৭. T B Bottomore, *Sociology: A Guide to Problems and Literature*, London, Unwin University Books, 1970, p. 271

৩৮. *দেখুন*, আনিসুজ্জামান, *সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি*, ঢাকা, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৯, পৃ. ১০৩

৩৯. কাজী নজরুল ইসলাম, *বারাঙ্গনা*, কবিতা সংগ্রহ, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ২০০৬. পৃ. ১৫৮

৪০. রংগলাল সেন ও বিশ্বম্ভর কুমার নাথ, ঐ, পৃ. ৩৩৩

৪১. *কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট*, ঢাকা, বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, ১৯৯৮, পৃ. ২৫৬

৪২. রংগলাল সেন, *বাংলাদেশ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, ঢাকা, শিখা প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ. ২৫৯